কষ্টিপাথর-২

মানসাঙ্ক

ধর্ষণ প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজ

ডা. শামসুল আরেফীন

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

অনুপ্রেরণা

আপনি, আপনারা।

একটু একটু করে লিখে আপনাদের দেখিয়েছি। আপনারা সাহস দিয়েছেন। নইলে এই টপিকে এই বই লেখার দুঃসাহস আমার কোনো দিনই হতো না। যা হয়েছে হয়েছে, এখন দুআ করেন। যেদিন এই কিবোর্ড, এই বই-প্রেস কিচ্ছু থাকবে না, সেদিন আল্লাহ এই ইখলাসটুকুর বদলা আমাদেরকে ভাগ করে দিন। তিনি তো দেবেন তাঁর মর্যাদা অনুপাতে, সেটা ভাগ হলেও কমে না। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

সূচিপাতা

অনুপ্রেরণা | ৫
১ম সংস্করণের ভূমিকা | ৯
১ম প্রকাশের ভূমিকা | ১০
সম্পাদকের কথা | ১৩
পরিভাষা | ১৯

মানসাঙ্ক

শুরু | ২৩
ধর্ষণ কী? | ২৬
একেকটা ধর্ষণের পর | ২৭
ও মন রে | ২৮
প্রস্তাবনা | ৩০

ফ্যাক্টর ১ : মেন্টাল সেটআপ
১.১ ইঞ্জিন ও বগি | ৩২
১.২ কন্ট্রোলরুম | ৩৬
১.৩ অলিগলি | ৩৮
১.৪ প্যারাফিলিয়া | ৪১

ফ্যাক্টর ২ : নির্জনতা | ৪৭
ফ্যাক্টর ৩ : উদ্দীপক | ৪৮

ধর্ষক কারা? | ৪৯
টাইপ ১ : স্যাডিস্ট রুচি | ৫২
টাইপ ২ : রেপ মিথে বিশ্বাস | ৫৪
টাইপ ৩ : নারীর প্রতি রাগ | ৫৬
টাইপ ৪ : স্বভাবগত রাগী বা অপরাধী | ৫৯
টাইপ ৫ : সুযোগসন্ধানী | ৬০

রিস্ক ফ্যাক্টর | ৬২

শুরু

বর্তমান বিশ্বসংস্কৃতির নাম পুঁজিবাদ। কম্পিউটারের যেমন অপারেটিং সিস্টেম থাকে (উইন্ডোজ, লিনাক্স ইত্যাদি), দুনিয়ার এখনকার অপারেটিং সিস্টেম হলো পুঁজিবাদ (capitalism)। পুঁজি কী জিনিস তা তো জানিই আমরা। যে টোটাল টাকা-টা ব্যবসায় খাটানো হয়, সেটাই পুঁজি। লাভ করে করে পুঁজি বাড়ানোই জীবনের সফলতার মূলমন্ত্র। যেহেতু জীবন কেবল এইটাই, আর মানবজীবন সার্থক হয় সুখকে উচ্চকিত করার দ্বারা, সুখ পেতে হলে ভোগ বাড়াতে হবে, আর ভোগ বাড়াতে চাইলে পুঁজি বাড়াতে হবে। এই পুঁজিকে আরও কীভাবে বাড়ানো যায়, ২৪ ঘণ্টা সেই ধান্ধায় থাকা আর তামাম দুনিয়াকে এই ধান্ধাবাজি নজরে দেখা-বিচার করাকে বলে পুঁজিবাদ। এটা একটা চেতনা। মোড়ল পরাশক্তি এই চেতনা ধারণ করে, প্রতিটা দেশ এই চেতনা ধারণ করে পলিসি বানায়। মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন থেকে নিয়ে মোড়ের টঙের মামা, কর্মজীবী নারী থেকে ভ্যানে করে মাছ বিক্রেতা পর্যন্ত এই চেতনা ধারণ করে, লালন করে, চেতনা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

ষোড়শ দশকে এই সংস্কৃতির নাম ছিল সাম্রাজ্যবাদ, তখন পুঁজিবাদ ছিল শিশু। গুটিকয়েক দেশ তাদের অস্ত্রের জোরে সারা দুনিয়া থেকে স্রোতের মতো সম্পদ চুষে[১] জমা করছিল ইউরোপে, যা শিল্পবিপ্লবের বদৌলতে খাটবে পুঁজি হিসেবে। জাস্ট নতুন বোতলে সেই পুরোনো মদেরই ভদ্র নাম 'পুঁজিবাদ'। 'বিশ্বায়ন'-এর নামে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশ থেকে 'সস্তায় শ্রম কিনে' পণ্য বানানো হলো। সেই পণ্যটাই আবার 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'র নামে আরেক গরিব দেশের বাজারে বিক্রি করা হলো। অনিবার্য ফল দাঁড়াল—আফ্রিকায় কেউ না খেয়ে মরবে, ভারতে কেউ খোলা মাঠে পায়খানা করবে। আর ওদিকে ৫০% সম্পদ গিয়ে জমবে মাত্র ১% মানুষের হাতে[২], তাদের পুঁজিতে পুঁজি বাড়বে, বাড়তেই থাকবে। মুনাফাজীবীদের চাই শুধু মুনাফা,

---

[১] লর্ড মেকলে লিখেছেন : ...শিল্পবিপ্লব, যার ওপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সম্ভব হয়েছিল কেবল ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে। যা কোনো লোন ছিল না, এমনিতেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তা নাহলে স্টিম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত ইংল্যান্ডের। ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান— এমনই লোকসান, যা ভারতে শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল, কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল... [Unhappy India, Lala Lajpat Rai, 1928]

[২] Half of world's wealth now in hands of 1% of population, The Guardian (Oct 2015)
Oxfam says wealth of richest 1% equal to other 99%, BBC (Jan 2016)

ব্যবসা তা যে জিনিসেরই হোক না কেন, যা লাগে করো—পতিতা-পর্নো-ড্রাগস। লাভ বেশি রাখতে যা দরকার করো—নামমাত্র বেতনে ৩য় বিশ্ব থেকে শ্রম কিনে নাও বা বিনাবেতনে খাটাও আধুনিক দাসদের। কে মরল কে আর্তনাদ করল দেখার সময় নেই, শোনার সময় নেই, গোনায় ধরার সুযোগ নেই। এত নীতি কপচালে ব্যবসা হবে না যে!

আর এদিকে ক্রেতা তৈরি করা হচ্ছে। যেসব পণ্য উন্নতরা বানাচ্ছে, সেগুলো কেনার জন্য তো লোক চাই, ভোগবাদী মানুষ। মধ্যযুগের স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্য দূর করে আনা দরকার ছিল ভোগের মহত্ত্ব। অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড বলেন :

> ষোড়শ শতকে এই নতুন শিশু অর্থনীতি (পুঁজিবাদ) থেকে **জন্ম নিল নতুন মনোভাব—বাজার-মানসিকতা, যার মূল্যবোধগুলো ভিন্ন ধরনের।**... ধর্মের শিক্ষা ছিল, আর্থিকভাবেও প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী। বিপরীতে নতুন এই মানসিকতায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন অপর সকলের চেয়ে উপরে ওঠা, অপরকে পিছে ফেলা আর টেক্কা দেবার প্রচেষ্টা। ভ্রাতৃভাবের চেয়ে প্রতিযোগিতাই দরকারি মানসিকতা এই নতুন ব্যবস্থাতে।... ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ সংগ্রহের দ্বারা মানুষ বিচার হতে লাগল।... অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝেই **এই নব্য অর্থনৈতিক ধারণা একটা 'সার্বজনীন জীবনধারা'য় পরিণত হয়ে পড়ে। সেক্যুলার ও বস্তুবাদী মূল্যবোধ, যা দ্বারা পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার মানুষ প্রভাবিত, এই নতুন দর্শনই ছিল তার ভিত্তি।** [৩]

শেখানো হলো 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে', গাড়িঘোড়া দিয়েই বিচার হবে তোমার অবস্থান। সুতরাং চাই-ই চাই গাড়ি-বাড়ি-জমি-ব্যাংক-ব্যালেন্স। ভোগেই মানবজনমের সার্থকতা, জীবন একটাই। যে-কোনোভাবে, এজন্য যা করতে হয় করো, নৈতিকতা এখন বদলে গেছে। সম্পদ না হলে তোমার জীবন বৃথা, পুরুষই হও আর নারী-ই হও। নারী, আর কতকাল হয়ে থাকবে মা-কন্যা-স্ত্রী? কোথায় তোমার নিজের বাড়ি-গাড়ি? জীবনের অপর নামই তো বাড়ি-গাড়ি-টাকা। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে, ক্যারিয়ারিজমের নামে, নারী ক্ষমতায়নের নামে ক্রেতা-ভোক্তার সংখ্যা বাড়ানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সে একই সাথে পণ্য বানাচ্ছে, ক্রেতাও বানাচ্ছে।

পরিবারে বাবা সন্তানের মাঝে deterred gratification তৈরি করে— 'এখন না বাবা, পরে কিনে দেব'। বাবা না থাকলে সেই পরিবারের সন্তান হয়ে উঠবে compulsive consumer, মানে হলো সে পণ্য কিনতেই থাকবে, ভোগ বাড়াতেই থাকবে— এই মানসিকতার।[৪] নতুন এই অর্থব্যবস্থা তো তা-ই চায়, ক্রেতা বাড়ানো,

---

[৩] ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড, অর্থনীতিবিদদের যুগ, পৃষ্ঠা : ১১-১৭।

[৪] Aric Rindfleisch et al. (1997). Family Structure, Materialism And Compulsive Consumption, Jounal of Consumer Research, vol 23, no.4, pp. 312-325

We buy things,
we don't need...
with money,
we don't have...
to impress people,
we don't like.

DAVE RAMSEY
finance advisor, author, radio host

শ্রমিক বাড়ানো। বিংশ শতাব্দীর ৬০-এর দশক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়, শিশু অর্থব্যবস্থা এখন সাড়ে তিন শ বছরের যুবক। সমাজতন্ত্রের সাথে লড়াইয়ে (স্নায়ুযুদ্ধ) পুঁজিবাদকে জিততে হবে, আরও দ্রুত ফুলে ফেঁপে ওঠার দরকার এখন। এতদিন যা টুক টুক করে করেছে, এখন করতে হবে পূর্ণ বেগে—প্রচুর শ্রমিক এবং প্রচুর ক্রেতা। যা যা কিছু ভোগকে নিরুৎসাহিত করে, অল্পে তুষ্টি এনে দেয়, 'ভোগ ছাড়া অন্য কিছুতে' জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে সহায়তা করে; তাকে তাকে সেকেলে, প্রগতির অন্তরায় বলে প্রতিষ্ঠা করা হলো—বিজ্ঞানকে ধর্মের বিপরীতে, নারীবাদকে পরিবারের বিপরীতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমাজের বিপরীতে ব্যবহার করা হলো। এগুলো হয়ে আসছিল আগের শতক থেকেই, এখন জোরেসোরে। যৌনতা, পরিবার, বিবাহ, নারী-পুরুষ সবকিছুর নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হলো, যা এই অর্থব্যবস্থার অনুকূল। যৌনতা হলো অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী; পরিবার গঠন হলো বোঝা, বিবাহ হয়ে গেল অপ্রয়োজনীয়, পুরুষের সাথে সাথে নারীও হয়ে উঠল ক্রেতা-করদাতা-ভোক্তা। আর পরিবার ছেড়ে বিপুল নারী এলো শ্রমবাজারে, শ্রমের যোগান বেড়ে গেল, ফলে বেতন গেল কমে।[৫] দ্বিগুণ ক্রেতা আর দ্বিগুণ ভোক্তা, ফেঁপে উঠল পুঁজিবাদ।

এই টাকার বিষে ভেঙে পড়ল পরিবার, সমাজ, কৈশোর, মনুষ্যত্ব। যে চাহিদাগুলো এতদিন পরিবার মিটিয়েছে, সমাজ মিটিয়েছে, পুঁজিবাদ সেগুলো ভেঙেচুরে সুযোগ করে দিচ্ছে নতুন নতুন ব্যবসার। কেননা চাহিদা তো আছেই, সেই চাহিদা পুরাতে এখন পণ্য এনেছে পুঁজিবাদ—মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। আগে এমনি মিটত, বা প্রয়োজনই ছিল না; আর এখন কিনে মেটাও। কিন্তু মানুষের স্বভাবগত যে সমাজ, স্বভাবগত যে পরিবার, স্বভাবগত যে রাষ্ট্র, তেমন সর্বাঙ্গসুন্দর সামগ্রিক

---

[৫] First, marital relationships may have been affected by the drop in men's real wages since the late 1960s (Hernandez 1993; Zill & Nord 1994) … Second, dramatic increases in labor force participation among mothers of young children (U.S. Bureau of the Census, Fig. 21, 1992) have increased the potential for work/family conflict. Third, both women and men but particularly women have become less traditional in their gender role attitudes since the late 1960s (Thornton 1989)
[STACY J. ROGERS and PAUL R. AMATO, University of Nebraska-Lincoln, Is Marital Quality Declining? The Evidence from Two Generations, Social Forces, March1997, 75(3):1089-1100]

'খুঁটিনাটি শূন্যস্থানপূরণ' টাইপ সমাধান তো আর কৃত্রিম-কমার্শিয়াল-মুনাফাসন্ধানী পুঁজিবাদ দেবে না, তাদের বানানো fragile family (অবিবাহিত দম্পতি) দেবে না, তাদের বানানো atomized সমাজ (বিচ্ছিন্ন সমাজ) দেবে না। আজ আমরা এই ভেঙে পড়া সমাজ, ভেঙে পড়া মনোজগতেরই একটিমাত্র বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করব। গতানুগতিক ধারা থেকে একটু বেরিয়ে চেষ্টা করব এর পেছনের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, কারণ, বিস্তার ও সমাধান তুলে ধরার। শুরু করা যাক।

আমাদের আজকের আলোচনার টপিক—'ধর্ষণ'।

ধর্ষণ কী?

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি-১৮৬০ এর ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর-সহ আরও বহু দেশ যারা ব্রিটিশপ্রণীত এই 'দণ্ডবিধি-১৮৬০' আত্মীকরণ করে নিয়েছে, সে সব দেশে ধর্ষণের সংজ্ঞা এটাই।[৬] সংজ্ঞাটা বুঝে নিতে হবে। কেননা আমাদের পরবর্তী বিভিন্ন আলোচনায় এটা কাজে আসবে।

> কোনো পুরুষ (A man) 'ধর্ষণ' করেছে বলা হবে, যদি নিচের ৫টা শর্তের যে-কোনো ১টায় পড়ে, যদি সে এমনভাবে কোনো নারীর (a woman) সাথে যৌনসঙ্গম করে (sexual intercourse) :
>
> প্রথমত, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (Against her will)
>
> দ্বিতীয়ত, তার সম্মতি ছাড়া (Without her consent)
>
> তৃতীয়ত, সম্মতি আছে। কিন্তু সম্মতি নেওয়া হয়েছে মৃত্যুভয় দেখিয়ে বা আহত করার হুমকির মুখে।
>
> চতুর্থত, সম্মতি আছে। কিন্তু মহিলা তাকে নিজ বৈধ স্বামী মনে করে ভুলে সম্মতি দিয়েছে। আর লোকটা কিন্তু ঠিকই জানে যে, সে তার স্বামী না।
>
> পঞ্চমত, ১৪ বছরের নিচের নারী, তার সম্মতি থাকুক আর না-ই থাকুক।
>
> ব্যাখ্যা : লিঙ্গ প্রবেশ করানোই (Penetration) ধর্ষণ প্রমাণে যথেষ্ট।
>
> ব্যতিক্রম : স্ত্রী যদি ১৩ বছরের নিচে না হয়, তবে **স্বামী কর্তৃক যৌনসঙ্গম ধর্ষণ নয়।**

তবে পশ্চিমা বিশ্বে ধর্ষণের সংজ্ঞা এখন আর এটা নেই। ধর্ষণের আধুনিক সংজ্ঞা কেবল যৌনসঙ্গম বোঝায় না। বা যৌনতা বলতেও এখন আর শুধু সঙ্গম বোঝায় না। আমেরিকায় ১৯২৭ সাল থেকে চলে আসা সংজ্ঞা ছিল : 'নারীর যৌনসঙ্গমের

---

[৬] Sec# 375 (Of Rape), CHAPTER XVI (OF OFFENCES AFFECTING THE HUMAN BODY), The Penal Code, 1860 (ACT NO. XLV Of 1860) [bdlaws.minlaw.gov.bd]

অভিজ্ঞতা, জোরপূর্বক এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ'। শুধু নারী যোনি ও পুরুষাঙ্গের মাঝে সীমাবদ্ধ এই সংকীর্ণ সংজ্ঞাকে বদলে FBI-এর Uniform Crime Report (UCR)-এর দেওয়া নতুন সংজ্ঞা :

> 'যোনি বা পায়ুতে **দেহের যে-কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু** প্রবেশন (penetration) যত অল্পই হোক, বা কারও মুখে লিঙ্গ প্রবেশন, ভিকটিমের সম্মতি ছাড়া'।[৭]

আবার সুইডেনের মতো কিছু অত্যাধুনিক দেশে আরেক ধরনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের নতুন আইনে বলা হয়েছে : **জোর করুক বা না করুক,** হুমকি দিক বা না দিক, মনে মনে সম্মতি নেই, এমন সহবাস মানেই ধর্ষণ। ভিকটিমের পক্ষ থেকে **শারীরিক প্রতিরোধ থাকা জরুরি না** (sex without consent is rape, even when there are no threats or force involved.)।[৮]

একেকটা ধর্ষণের পর...

প্রতিটি ধর্ষণের পর দেখবেন জনগণ দুটি দিকে ভাগ হয়ে যায়।
একপক্ষ পুরো দায় ভিকটিম নারীর পোশাক-আশাক, চলাফেরার ওপর দিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলে। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন :

- নারীর শরীরী প্রদর্শন ও পোশাকই যদি ধর্ষণের একমাত্র ফ্যাক্টর হয়, তাহলে অ-নারী (অবিকশিত নারীত্ব) ৩ মাস বয়সি বাচ্চা কী উগ্রতার কারণে, ৪ বছরের গালফোলা খুকিটা আর ৭ বছরের ময়লামাখা টোকাই বালিকাটি কোনো শরীরী আবেদনের কারণে ধর্ষণের শিকার হলো?
- ৯ বছরের বাচ্চা ছেলেটা তার কোনো শরীরী উগ্র প্রদর্শনের কারণে জানোয়ারের চোখে পড়ল?
- হাঁস-মুরগি-ছাগল-গরুটার 'পোশাক' কতটুকু শালীন হলে ঘটনাটা ঘটত না?

আরেক পক্ষ পুরো দায়টা ধর্ষকের মানসিক বিকৃতির ওপর চাপিয়ে 'কে জানে কার' সমর্থন আদায় করতে চায়। 'আমি কী পড়ব সেটা আমার ব্যাপার'—এই দ্বিতীয় পক্ষের কাছে আমার প্রশ্ন : পুরুষের মানসিকতাকেই একমাত্র কারণ মনে করছেন, তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে কালোব্যাজ ধারণ করছেন—ঠিক আছে, ফাইন।

---

[৭] AN UPDATED DEFINITION OF RAPE, U.S. Department of Justice

[৮] Press release from Ministry of Justice (26 April 2018). Consent – the basic requirement of new sexual offence legislation. Government Offices of Sweden.
Sweden approves new law recognising sex without consent as rape, BBC [24 May 2018]

- কিন্তু এই মানসিকতাটা কেন ডেভেলপ করল?
- কী ফ্যাক্টর দায়ী?
- কী কী ফ্যাক্টর দূর করলে এই রকম মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষ আর কখনও জন্ম নেবে না?
- শাস্তিটা কেমন হলে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে পটেনশিয়াল রেপিস্টদের কাছে?

আসলে আপনারা কী চান, মানববন্ধনের ফটোসেশান, নাকি সমাধান? আপনারা নিজেরাই জানেন না হয়তো।

আসুন না, আজ একটু গভীরে ডুব দিই, দেখি কী পাওয়া যায় শেষমেশ। অক্সিজেন সিলিন্ডারে পর্যাপ্ত মনোযোগ আছে কি না দেখে নিন। এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, মানবমনের এমন কিছু অন্ধকার অলিগলিতে যেখানে বন্ধ হয়ে আসে দম, গুলিয়ে আসে গা আর বিস্ময়ের আতিশয্যে ভাষা হয় স্তব্ধ—এমনটাও হয়!

ও মন রে...

ফার্মগেট ওভারব্রিজের ওপর নিজেকে কল্পনা করুন। কর্মদিবসের ব্যস্ততায় জীবন্ত ফুটপাত, 'ছুটন্ত' রাস্তা। যেন রাস্তাটারই সময় নেই। হাজার হাজার মানুষ, ফর্সা-শ্যামলা, নারী-পুরুষ, বাচ্চা-বুড়ো। প্রতিটি চেহারার দিকে তাকান, কী দেখছেন? আপনি দেখছেন মুদ্রার একটা পিঠ, এবং এই প্রতিটি মুদ্রার একটা ওপিঠ-ও আছে—যাকে 'মন' বলে। মন কী বলেন দেখি? মন কি জাস্ট মগজের কিছু নির্জীব রাসায়নিক মিথস্ক্রিয়া (Neurotransmitters), না কি আমিত্বের অনুভূতি? (The thinking-feeling of 'I')। ওদিকে মনোবিদ ফ্রয়েড আবার বলে গেছেন, আমিত্বের এই অনুভূতিটাও নাকি মগজের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ারই একটা অংশ, আলাদা কিছু না। মানে আপনার এই হাসি-কান্না-ভালোবাসা-কষ্ট-স্বপ্ন-আশা স্রেফ মূল্যহীন অর্থহীন কিছু কেমিক্যাল। এটা কোনো কথা!

কষ্ট পেলেন? বস্তুবাদের চোখে আপনি একজন যথার্থ পশু (homme machine), আপনার ও একটা কুকুরের পার্থক্য গুণগত না, স্রেফ স্তরগত। আচ্ছা, তাহলে একটা চিত্র কি শুধুই রঙের আঁচড়, একটা কবিতা কি শুধুই শব্দের গাঁথুনি? একটা কবিতার বই আর একটা অভিধানের মধ্যে যে পার্থক্য, মানুষ এবং 'বস্তুবাদের মানুষ'-এর মাঝে সেই পার্থক্য। পৃথিবীর সকল বিজ্ঞান মিলে যা বলবে, মানুষ তার চেয়েও বেশি কিছু। মানুষের এই অসম্পূর্ণ বস্তুবাদী সংজ্ঞার ওপর ভর করে আধুনিক দুনিয়া পরিবার-সমাজ-

রাষ্ট্র-অর্থ-জীবনের যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে, তা আর সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।[৯] James Madison University-র মনোবিদ্যার প্রফেসর Gregg Henriques, Ph.D আমাদের 'মন' বোঝানোর জন্য চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। ধরুন একটা বই। আপনার মগজের রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলো হলো বইটার পৃষ্ঠা, বাঁধাই, রং, মসৃণতা, গন্ধ—এগুলোর মতো। আর আপনার 'মন' হলো বইয়ের গল্পটা, কাহিনিটা বা বিষয়বস্তু।[১০] ঠিক আছে না এবার?

মনের একটা অংশের ছাপ ফুটে ওঠে চেহারায়—টেনশন, কষ্ট, আনন্দ, উচ্ছ্বাস। ব্যক্তি নিজেই এগুলো প্রকাশ করে স্বেচ্ছায়। মনের আরেকটা অংশ আপনি নিজেও সব সময় নাও বুঝতে পারেন; তবে তার আশপাশের মানুষ বুঝতে পারে আপনার আচরণে-কাজেকর্মে—সরলতা, ধূর্ততা, পরশ্রীকাতরতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, ঘৃণা, যৌনতা।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক যাকে বলে, সেই সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, মানবমনের ৩টি স্তর রয়েছে :

১. চেতন স্তর (concious)
২. অবচেতন স্তর (sub-conscious)
৩. অচেতন স্তর (unconscious)

তাঁর মতে, মানুষের যেসব কামনা-বাসনা বা মনোবৃত্তি সমাজে অবৈধ বা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়, সেগুলো শাস্তির ভয়ে অবদমিত হয়ে এই অচেতন স্তরে এসে জমে। এগুলোই পরে ভুল-ভ্রান্তি, স্বপ্ন ও মানসিক বিকার হিসেবে প্রকাশ পায়।[১১]

কিন্তু আরেকটা অংশ আছে বোঝা যায় না, জানা যায় না, ধারণাও করা যায় না। সে অংশটা সে নিজে লুকিয়ে রাখে সজ্ঞানে, সে অংশটার আলোচনা আমাদের জন্য ট্যাবু। মনের সেই গোপন কুঠুরির খবর কেউ কারওটা জানে না, সেখানে আইডিয়া চলে না, সেখানে সূত্র খাটে না। প্রেমিকা জানে না প্রেমিকেরটা, স্বামী জানে না স্ত্রীরটা, সহকর্মী জানে না সহকর্মীরটা। আমি যৌনমনোজগতের কথা বলছি না, এ জগতে তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে কিছুটা হলেও চেনে, জানে, বোঝে। সেই গহিনে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই, এমনকি ব্যক্তি নিজেই সেখানে প্রবেশ করে কালেভদ্রে। যখন আর কেউ দেখে না, যখন শেখানো সব সভ্যতা-ভদ্রতা-মূল্যবোধ-লজ্জা আর

---

[৯] John Watson (1913), No Dividing Line between Man and Brute, Psychological Review, No.20, p158

[১০] Gregg Henriques, What Is the Mind? Understanding mind and consciousness via the unified theory, Psychology Today

[১১] ড. আবদুল খালেক, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে কাম, মন ও মনোবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা : : ১৪৪।

সুকুমারবৃত্তি পরাস্ত হয়, ঠিক তখনই পরাজিত এক এক সৈনিক প্রবেশ করে মনের গহিনে, নিষিদ্ধ এক প্রকোষ্ঠে।

প্রস্তাবনা

আমাদের জানা প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনা স্মরণ করার চেষ্টা করুন তো দেখি। দেখবেন :

- ধর্ষণের শিকার শুধু পূর্ণযৌবনা নারী-ই হচ্ছে না। **ভিকটিমের তালিকায় আছে নারীবৈশিষ্ট্যহীন মেয়েশিশু, পুরুষ, এমনকি পশুপাখিও।** লিঙ্গ-প্রজাতি এসবকিছুরই বালাই নেই।
- ধর্ষণ শুধু ঘরের বাইরের লোকের দ্বারা হচ্ছে তা-ও নয়। এসব লিখতেও খারাপ লাগে। **আপন নিকটাত্মীয়ও জানোয়ারের রূপ ধরে ফেলার খবর** আমাদের কাছে আছে।
- **রাত ও নির্জন জায়গা** ওদের প্রাইম চয়েস। যা থেকে মনে হয়, ধর্ষণ ব্যাপারটা সব সময় পরিকল্পিত।
- আবার যথেষ্ট বিকৃতমনা না হলে শিশু-পুরুষ-পশুপাখি নিয়ে কেউ পরিকল্পনা করবে না যে, এই বাচ্চাটাকে কখন পাওয়া যায় বা সেক্সি মুরগিটাকে কীভাবে নির্জনে নেওয়া যায়। যা থেকে মনে হয়, **ধর্ষণ পুরোপুরি পরিকল্পিতও নয়, অনেক ক্ষেত্রে অকস্মাৎ, ধর্ষকের জন্যও হঠাৎ।** মানে অনেকটা ইমার্জেন্সি।

এবার আসেন, সব ধর্ষণের ঘটনাকে আমরা একটা কমন ফর্মুলায় ফেলা যায় কি না দেখি। তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় :

১. মেন্টাল সেটআপ বা মানসিকতা
২. পরিবেশ
৩. স্টিমুলাস বা উদ্দীপক

এই ৩টি ফ্যাক্টর মিলে গেলে ধর্ষণ হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না, কিছুতেই না। একটু ব্যাখ্যা দরকার তাই না? আচ্ছা। আমাদের প্রস্তাবনা হলো ধর্ষণ সংঘটিত হয় যখন—

১. একজন অনিয়ন্ত্রিত অথবা বিকৃত যৌন চাহিদাবিশিষ্ট মানুষ (পুরুষই ধরে নিচ্ছি, তবে নারীকেও একদম বাদ দিচ্ছি না)।

২. যদি নির্জন বা 'পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট নির্জন' পরিবেশে।

৩. **যৌন-উদ্দীপক (নট যৌন-উত্তেজক)** কিছুকে পায়। ভিকটিমকে উর্বশী তিলোত্তমা-ই হতে হবে, এমন না। ওই ধর্ষকের জন্য যৌন-উদ্দীপক হলেই হবে। ওই মেন্টাল সেটআপে বা ওই বিকৃতিতে ওইটাই উদ্দীপক (স্টিমুলাস)। **যেমন ১ এর জন্য যেমন ৩ দরকার, তেমনটা হলেই হবে।** সেটা জন্তু হলেও হবে। আবার পড়ুন।

উদাহরণ দিলে আরও ক্লিয়ার হবে,

➡ **যার যৌনমনোজগৎ এতটাই অনিয়ন্ত্রিত যে, যে-কোনো মূল্যে তার 'লিঙ্গ প্রবেশন' (penetration) দরকার, এমন কারও কাছে ...(১)**

➡ **নির্জনে... (২)**

➡ **উত্তেজক না হলেও তার কাছে তখন শিশু-পশু-মৃতদেহ সবই উদ্দীপক... (৩)**

কিছুই নিরাপদ না। বোরকা পরা কোনো নারীও যদি নির্জনে ওই-জাতীয় মেন্টাল সেটআপের (যার কাছে ওই মুহূর্তে সেক্স ইমার্জেন্সি) কারও কাছে পড়ে গেলে, ঘটনা ঘটবে; যেমনটি আমরা কিছুদিন আগেই এক গর্ভবতী মাদরাসা শিক্ষিকার বেলায় দেখেছি। মোদ্দা কথা, এই ৩টি ফ্যাক্টর একত্র হলে যদি মিরাকল না ঘটে তাহলে ধর্ষণ হবে। আমরা আবার এই পয়েন্টে ফিরে আসব মানবমনের কিছু অলিগলি ঘুরে। তখন আরও সহজ হবে বুঝতে।

আমার প্রস্তাবনা হলো,

নির্দিষ্ট মেন্টাল সেটআপের কেউ (১) নির্দিষ্ট জায়গায়/সময়ে (২) নির্দিষ্ট স্টিমুলাসের কিছু পেলে (৩) ধর্ষণ সংঘটিত হয়।

এবার আমরা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করছি।

ফ্যাক্টর ১ : মেন্টাল সেটআপ

১.১ ইঞ্জিন ও বগি

যৌনতা সহজাত মানবচাহিদা। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আরাম-মলমূত্রত্যাগ এগুলো যেমন সহজাত মানবিক আবশ্যিক প্রয়োজন। যৌনতাও আলাদা কিছু নয়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এগুলোকে বলে 'প্রেষণা' (Motivation)।

দুয়েকটা খটমট কেতাবি সংজ্ঞা দেখে নিই।

মনোবিজ্ঞানী Woodworth এর মতে,
প্রেষণা ব্যক্তির একটি অবস্থা বা প্রবণতা যা তাকে কোনো আচরণ বা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করে।

মনোবিজ্ঞানী Wenger বলেন,
প্রেষণা হলো প্রাণীর একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা যা তাকে এক বিশেষ ধরনের কাজে অবিরত লেগে থাকতে বাধ্য করে।

মানে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলে প্রাণীর মধ্যে যে গতিশীল/সক্রিয় অবস্থার (driving force) সৃষ্টি হয় তাকে প্রেষণা বলে। এ অবস্থায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার তীব্র ইচ্ছার উদয় হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্দেশ্য পূরণ না হয় ততক্ষণ এই গতিশীল অবস্থা চলতে থাকে।[১২]

সোজাসাপ্টা কথা হলো, যার খিদে লেগেছে, সে বেচারা খিদে না মেটা অবধি ঘুর ঘুর করতে থাকবে। বারবার ফ্রিজ খুলবে, দোকানে যাবে, টাকা না থাকলে চুরি করবে, শক্তি থাকলে ডাকাতি করবে। কিছু খেতে না পারা পর্যন্ত সে গতিশীল থাকবে। এমনি করে অন্যান্য প্রেষণার ক্ষেত্রেও। তাহলে এরকম আরও প্রেষণা কী কী আছে আমাদের, যা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়?

নানান দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেষণার প্রকারভেদ করেছেন বিজ্ঞানীরা। আমেরিকান মনোবিদ Abraham Maslow, যিনি বিংশ শতকের টপ-টেন মনোবিদদের একজন

---

[১২] মন ও মনোবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা : ১৪, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ ১৯৯৬, সম্পাদনা: ড. আবদুল খালেক, অধ্যাপক ঢাবি।

বলে স্বীকৃত এবং আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তার বিখ্যাত 'Maslow's hierarchy of needs' বা 'চাহিদার ক্রমবিন্যাস' প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এক লেভেলের চাহিদা পূরণ হলে পরে মানুষ পরের লেভেলের চাহিদার জন্য প্রেষণা অনুভব করে। সেটার পিছনে ছোটে। এর সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে মৌলিক শারীরিক চাহিদা : শ্বাস, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা, ঘুম, মলমূত্র ইত্যাদি। যা না হলে দেহ ঠিকমতো কাজই করবে না। এগুলো না হলে বাকি চাহিদাগুলো গুরুত্বহীন।[১৩]

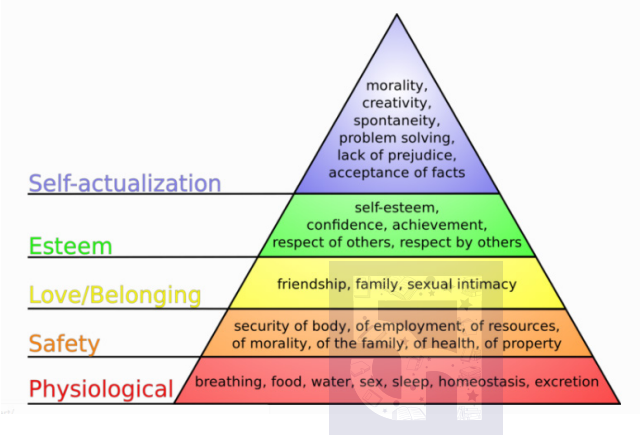

এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে, যৌনতা মানে কিন্তু বিয়ে না, বা কেবল নারী না। নারী ছাড়া যদি কোনো পুরুষকে দীর্ঘদিন রাখেন, তাহলে সে ভিন্ন কিছু খুঁজে নেবে। কিছু না পেলে নিদেনপক্ষে নিজেকেই ব্যবহার করবে। কিন্তু চাহিদা মিটতেই হবে। প্রেষণার সংজ্ঞা তা-ই বলে। যৌনতার ধরন (manifestation) বদলে হলেও সে যৌনতার দাবি পূরণ করবে, নারী নাহলে পুরুষ (সামনে 'প্রিজন-রেপ' বিষয়টা আসছে), না হলে শিশু, নয়তো গরু-ছাগল। সহজে প্রেষণা পূরণ না হলে চুরি করবে, শক্তি-সুযোগ থাকলে জোর করবে। এজন্য যৌনসঙ্গী পাওয়াকে (sexual intimacy) ৩ নং লেভেলের চাহিদা রাখা হয়েছে, কিন্তু যৌনতাকে (sex) সবচেয়ে বেসিকেই রাখা হয়েছে।

যৌনতার ব্যাপারে Maslow-র অবস্থান নিয়ে বেশ সমালোচনা আছে। খাবার, পানি, ঘুম,[১৪] পেশাব—এগুলো বন্ধ করে দিলে মানুষ মারা যায়। কিন্তু সেক্স আটকে দিলে তো সে মারা যায় না, বেঁচে থাকার জন্য সেক্স জরুরি না ('ভালোভাবে' বেঁচে

---

[১৩] McLeod, S. A. (2020, March 20). Maslow's hierarchy of needs. Simply Psychology.

[১৪] জি, সম্পূর্ণরূপে ঘুম বন্ধ করে দিলে প্রাণী মারা যায়। ১৮৯৮ সালে ইতালির এক বিজ্ঞানী ২টা কুকুরকে ১ সপ্তাহ ঘুমাতে না দেওয়ায় তারা মারা যায়। ২০১২ সালে চীনে এক ফুটবল ফ্যান ১১ দিন নির্ঘুম কাটিয়ে মারা যায়। Scientific American জানাচ্ছে, মানুষ ৮-১০ দিন না ঘুমিয়ে থাকতে পারে। গিনেস রেকর্ড ২৬৪ ঘণ্টা। [Man Dies After Going 11 Days Without Sleep: What Are The Health Risks Of Sleep Deprivation? The Huffington Post. June 27, 2012]

থাকার জন্য প্রয়োজন)। তাহলে একই লেভেলে রাখা কীভাবে যুক্তিযুক্ত? Arizona State University-র মনোবিদ প্রফেসর Douglas T. Kenrick, Ph.D.-এর মতে পরিবার গঠন (familial), সন্তান জন্মদান (procreational), আবেগ আদানপ্রদান (emotional) থেকে আলাদা করে যৌনতাড়নাকে শারীরবৃত্তি হিসেবে দেখানো ঠিক না। বরং তিনি এই পুরোটাকে Mating নামে আলাদা একটা স্তরে রাখার পক্ষে।

সব মিলিয়ে যৌনতাকে ঘিরে পশ্চিমা ভোগবাদী আধুনিকতার বক্তব্য হলো, সেক্স ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতো শারীরবৃত্তি না যে, এটা ছাড়া শরীরই টিকবে না। এটা জরুরি (need) না, যা লাগবেই; বরং এটা একটা চাহিদা (want), শারীরবৃত্তি না বলে বড়জোর মনোবৃত্তি (psychological need) বলা যায়। অথচ, কেবল সরাসরি শরীর খারাপ করা ছাড়া মৌলিক প্রয়োজনের আর সকল শর্তই পূরণ করে 'যৌনতা'। হ্যাঁ, ৫ মিনিট বাতাস না পেলে বা ৫ দিন পানি না খেলে দেহ যেমন মারা যায়, তেমনটি যাবে না। কিন্তু মৃত্যুহার বাড়ানোতে এবং মন-হয়ে-শরীরকে অসুস্থ তো করে। ক্ষতিটা ৫ মিনিটে হয়তো আমরা বুঝছি না, ৫ বছরে গিয়ে হয়তো বোঝা যাচ্ছে। [পরিশিষ্ট ৫ দেখুন]

এটা পুঁজিবাদেরই একটা কৌশল— **এক, যৌনতাকে মানবীয় আবশ্যিক প্রয়োজন হিসেবে স্বীকার না করা। ফলে এর আলোচনাই নিষ্প্রয়োজন।** পুষ্টিকর খাদ্য আলোচনায় আসবে; নিরাপদ পানি, পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে সভা-সেমিনার-সংস্থা হবে, আইন হবে। কিন্তু যৌনতাকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর করার জন্য আইনের প্রয়োজন নেই, যেহেতু এটা বেসিক নিড না। **আর দুই, আবেগ-প্রজনন-সামাজিক দিকটা অগ্রাহ্য করে একে নিছক individual psychological need হিসেবে দেখানো, যাকে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের অধীনে আনার দরকার নেই।** যৌনতাকে অনাবশ্যক প্রমাণ করে দিতে পারলে ব্যবসা আর ব্যবসা। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান ছাড়া মানুষ বেশি বস্তুবাদী হয়, ভোগের প্রবণতা এবং বস্তুগত সম্পদ অর্জনের প্রবণতা তাদেরকে তাড়িত করে (compulsive consumption)।[১৫] সুতরাং পরিবার গঠনের পথে যত অন্তরায় সৃষ্টি করা যাবে এবং যত পরিবারকে ভেঙে দেওয়া যাবে, তত ভোক্তা বাড়বে, ক্রেতা বাড়বে, মুনাফা বাড়বে। তা ছাড়া পরিবার যে প্রয়োজনগুলো পুরা করত, পরিবারের অনুপস্থিতিতে সেই চাহিদা পূরণে পুঁজিবাদ নতুন পণ্য-সেবা তৈরি করবে। এর কৌশল হলো, প্রাচ্যের রক্ষণশীল সমাজে, যারা বিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকতা ছাড়া যৌনতা পূরণ করে না, সেখানে যৌনতাকে উচ্চারণ না করে বিয়েকে পিছিয়ে দেওয়া। আর পশ্চিমে প্রাতিষ্ঠানিকতাকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করা। ফলে—

---

[১৫] Aric Rindfleisch et al. (1997). Family Structure, Materialism And Compulsive Consumption, Jounal of Consumer Research, vol 23, no.4, pp. 312-325

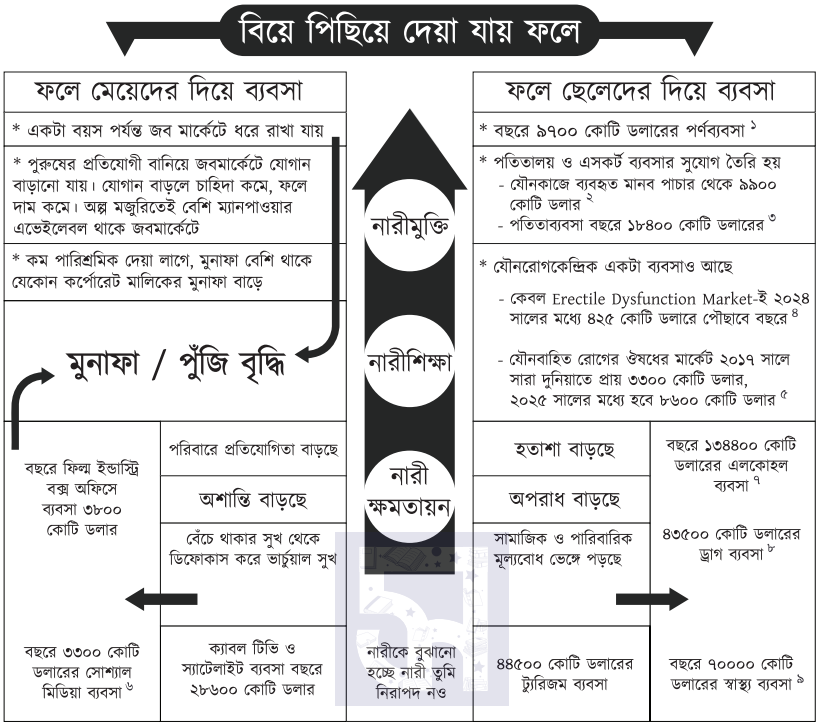

খাদ্যের প্রেষণা যেমন তাকে খাবারের সন্ধানে লাগিয়ে দেয়, খাওয়ার মধ্যেও সীমারেখা আছে, আদব আছে, সভ্যতা আছে। আপনি চাইলেই কারও কাছ থেকে কেড়ে খেতে পারেন না, দোকান থেকে খাবার ডাকাতি করতে পারেন না। ক্ষুধামন্দা, অতিভোজন, বেশি বাছবিচার—সবই সমস্যা। ঘুমেও তেমনি; অনিদ্রা,অতিনিদ্রা, নিদ্রালুতা, নিদ্রাপ্রিয়তা—কোনোটাই কাম্য নয়। মানে, সহজাত মানবচাহিদাও লাগামছাড়া হবে না, চাহিদা হবে নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত চাহিদা দেয় সুস্থজীবন-সুস্থ সমাজ-সুস্থ পৃথিবী। আর অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা ব্যক্তিকে ধ্বংস করে, সেই সাথে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র সব।

প্রথমত স্বীকার করে নিতে হবে যৌনতা একটা স্বাভাবিক মানব চাহিদা, যেমনটি ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ঘুম। আলাদা কিছু না। সামনে খাবার থাকলে কিংবা না থাকলে, পানি থাক বা না থাক, আরামের ব্যবস্থা থাক বা না-ই থাক, মলত্যাগের ব্যবস্থা থাকলে কিংবা না থাকলেও, প্রয়োজন দেখা দিলে এগুলো পূরণ করা হবেই, করতে হবেই; কেউ আটকাতে পারবে না। সহজাত বিষয়গুলো বদলে দেওয়া যায় না, অবদমন করা যায়

না, বড়জোর প্রকাশ বদলে দেওয়া যায়। প্রেষণার সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি, প্রেষণা পূরণ করার জন্য প্রাণী যে-কোনো উপায় খুঁজে নেয়। তেমনি যৌনতার পরিবেশ করে দিলে, কিংবা না দিলেও, প্রাণী চাহিদা পূরণের জন্য পরিবেশ করে নেবে। স্বাভাবিক উপায় না পেলে ভিন্ন উপায়ে যাবে, কাউকে না পেলে নিজে নিজেই, কিন্তু যাবেই। এটাই প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক। তবে **অন্যান্য প্রেষণা/চাহিদার মতো, এটাও হতে হবে লাগামওয়ালা, নিয়ন্ত্রিত, সীমানিরূপিত ও ভদ্রোচিত।**

১.২ কন্ট্রোলরুম

শুরুতে মনোজগতের এক গোপন কুঠুরির কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম। যাকে ব্যক্তি সজ্ঞানে আড়াল করে চলে। এমনিতেই মনোজগৎ একটি গুপ্ত বিষয়। তার মাঝে যৌনমনোজগৎ আরও গোপনীয়। সেই গহিন যৌনমানসেরও গহিনে গিয়ে দেখা মেলে আরেকটি কন্ট্রোলরুমের, যার নাম—**যৌন প্রতীকবাদ বা সেক্সুয়াল সিম্বলিজম।**

সিম্বলিজম কী চিজ সেটাতে পরে আসছি, আগে দেখি সিম্বল কী। সিম্বল শব্দের অর্থ প্রতীক। যৌনমনোবিজ্ঞানের ভাষায়, **যা ব্যক্তির মাঝে যৌনকাজে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং যে জিনিসের দ্বারা সে যৌনকাজে উদ্বুদ্ধ হয় (Turn on) সেটিই তার জন্য যৌন প্রতীক বা সিম্বল।** সেই জিনিসটি তার যৌন প্রেষণাকে (motivation) নিয়ন্ত্রণ করে। সোজা বাংলায়, যে জিনিস দেখলে কাম জাগে, যৌন-প্রেষণা জাগে। সবার সব জিনিস দেখলে ইচ্ছে হয় না। জ্যান্ত মানুষ-ই হতে হবে এমন না। একজনের জন্য যেটা যৌন-সুড়সুড়ি, আরেকজনার জন্য সেটা হাইস্যকর। কী কী জিনিস যৌন-প্রতীক হতে পারে সেটায় একটু পরে আসছি।

ফ্রয়েডের বিখ্যাত মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব (psychoanalytic postulate) অবশ্য আমাদের বলে যে শুধু যৌন বিষয় না, অন্যান্য অযৌন কর্মকাণ্ডেও 'যৌন সিম্বলিজম' আমাদের অজান্তেই আমাদেরকে ঠেলে নিয়ে যায়। মানে যৌনতার বাইরেও দৈনন্দিন জীবনে আমরা কী আচরণ করব, কী কেনাকাটা করব, তা-ও ঠিক করে দেয় আমাদের কাম-প্রবৃত্তি, এবং আরও স্পষ্ট করে বললে 'আমাদের সিম্বলিজম'। হোয়াট?!

জি স্যার, Hofstra University-র এক রিসার্চে ১৯৮৫টি ডাটা ফলো-আপ করে বেরিয়ে আসে আমি এতক্ষণ যা বললাম। তারা ক্রেতার ক্রয় করার ইচ্ছার ওপর সেক্স সিম্বলের প্রভাব আছে কি না, দেখতে চাইলেন। মদের কিছু বিজ্ঞাপনে তারা যৌন সিম্বল রাখলেন যা দেখলে যৌনমিলনের কথা মনে পড়ে। আর কিছু বিজ্ঞাপন রাখলেন সাদামাটা, সিম্বলিজম ছাড়া। দেখা গেল, ক্রেতারা সব সময় যৌন সিম্বলযুক্ত পণ্যটা কিনছে (Ruth, 1989)। মানে, এই রিসার্চটা ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বকে সাপোর্ট করল। **কেনাকাটার মতো একটা নির্দোষ অযৌন বিষয়েও যৌনসিম্বল প্রভাব ফেলছে।** তবে ফ্রয়েড যেমন দাবি করেছেন, মানুষের সব চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণই যৌনতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয় মনোবিদ-মহলে। তবে যৌন অনুভূতি যে ব্যক্তিচরিত্রের একটা শক্তিশালী নিয়ামক, তা আজ সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত।[১৬] অন্যান্য অযৌন আচরণ বাদ দিলেও, বিশেষ করে **যৌনজীবনটা যে যৌনসিম্বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এতে তো কোনো সন্দেহ নেই।**

কোনো ব্যক্তির পুরো যৌনকাঠামো (মন + আচরণ)-টাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার সিম্বল। প্রথম দিকের গবেষকগণ মানুষের যৌনজীবনের একটিই কাঠামো হতে পারে বলে বিশ্বাস করতেন—যার জন্য তারা এর নামকরণও করেননি, একটাই তো। বিপরীত লিঙ্গকে দেখলে বা বিপরীত লিঙ্গের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্রতি আকর্ষণ জাগবে—সিম্পল। এবং মনে করা হতো, ব্যক্তি সহজাতভাবেই এই কাঠামোটিকে আবিষ্কার করে নেবে বড় হলে, শিখিয়ে দেবার দরকার নেই। কিন্তু পরবর্তী গবেষকদের বিস্তৃত অনুসন্ধানে উঠে আসে এক বিশাল মহাসাগর। **তারা বলতে বাধ্য হন—মূলত পৃথিবীতে যত জন মানুষ আছে, যৌনজীবনের ঠিক ততগুলোই কাঠামো রয়েছে।**[১৭] প্রতিটি মানুষের যৌন কাঠামো ইউনিক, একদম ভিন্ন ভিন্ন। কাছাকাছি হতে পারে, কিন্তু হুবহু এক হয় না কখনই। এর কারণ হলো, **প্রত্যেকের সিম্বল ভিন্ন, যৌন আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ভিন্ন, ফলে যৌনচিন্তাও ভিন্ন ভিন্ন।**[১৮] আসুন দেখি কতটা ভিন্ন, এটা কি অলিগলি? নাকি এক গোলকধাঁধা? এমনও সম্ভব?

---

[১৬] ড. আবদুল খালেক সম্পাদিত, মন ও মনোবিজ্ঞান, (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ ১৯৯৬), পৃষ্ঠা : ১৪৮।

[১৭] The Psychology of Sex, Havelock Ellis, পৃষ্ঠা : ১২৬

[১৮] 'যৌন কাঠামো ইউনিক, ভিন্ন ভিন্ন' মানে এই না যে, সব কাঠামোই স্বাভাবিক ও অনুমোদনযোগ্য। কারও যৌন সিম্বল শিশু হলে সেটা মেনে নেওয়া হবে না, স্বাভাবিকও বলা হবে না। কোন কোন শর্তে যৌন সিম্বল 'বিকৃত' বলে অভিহিত হবে তা সামনে আসছে।

১.৩ অলিগলি

স্ত্রীর পা দেখে কামার্ত হওয়া যতটা স্বাভাবিক ও সুন্দর, যে-কোনো নারীর পা দেখে কামার্ত হওয়া তার থেকে একটু 'কেমন যেন' হলেও স্বাভাবিকের পর্যায়েই আছে। কিন্তু কারও সিম্বল যখন শিশু বা পশু, তা তখন বিকৃতির মধ্যে চলে গেল। এগুলো সবই সিম্বল। একজনের জন্য যা সিম্বল, আরেকজনের জন্য তা কিছুই না, কিংবা হাস্যকর, বা ঘেন্নার। স্তন কমবেশি সব স্বাভাবিক পুরুষের জন্যই সিম্বল, কিন্তু জুতো সবার জন্য সিম্বল না। চুল কারও উত্তেজনার সূচনা, কারও কাছে কিছুই না। নিজ স্ত্রীর পোশাক বা অন্তর্বাস দেখে কাম জাগতে পারে, আবার সব নারীর পোশাক দেখেও উত্তেজনা আসতে পারে। কিংবা পোশাক না, জাস্ট থানকাপড় বা ফেব্রিক দেখেও (সিল্ক, সাটিন, ল্যাটেক্স, ফার) কামভাব আসতে পারে কারও।

এগুলোর কিছু আছে স্বাভাবিক মিলনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে, যেমন স্ত্রীর পোশাক দেখে মিলনের আগ্রহ আসা। কিন্তু স্ত্রীর পোশাকই যদি স্ত্রীকে বাইপাস করে ফেলে মুখ্য আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়, তা হয়ে পড়ে অস্বাভাবিক। এভাবে একদম নির্দোষ সিম্বলও হয়ে যেতে পারে বিকৃতির কারণ।

এবার দেখি সিম্বলিজম কী। সিম্বলিজম হলো একটা এমন অবস্থা, যখন যৌনতার পুরো মানসিক প্রক্রিয়াটা আবদ্ধ হয়ে যায় বা সরে আসে **এমন জিনিস/বিষয়/কাজের দিকে (প্রতীক)**, যা মিলনের শুরুতে সীমাবদ্ধ থাকার কথা ছিল বা সেক্সবহির্ভূত কিছু।[১৯] কিছুই বোঝা গেল না, তাই তো? ধরেন, একজন লোকের পুরো যৌনচিন্তাটাই কেবল পায়ের মধ্যে আবদ্ধ (জাস্ট ফোর-প্লে হলে ঠিক ছিল)। বা যৌন-আগ্রহ থেকে নিয়ে চরমানন্দ বা অর্গাজম— পুরোটাই হাই-হীল জুতোর মধ্যেই আটকে আছে (জড়বস্তু)। ক্লিয়ার?

কোনো মানুষই এই সিম্বলের বাইরে না। সিম্বল একটা ব্যাপক টার্ম। 'যা কিছু' মানুষের যৌন আগ্রহের 'সুইচ' হিসেবে কাজ করে সবই সিম্বল। সেটা অতিস্বাভাবিক প্রেমের প্রকাশ হতে পারে, আবার অত্যন্ত ভয়াবহ যৌনবিকৃতিও হতে পারে। কেবল 'সুস্থ যৌন অনুভূতির **শুরু**' (যেমন স্ত্রীর পা) এবং 'মিলনের **সহায়ক**' (স্ত্রীর পোশাক) হতে পারে, আবার 'সুস্থ যৌনমিলনের **বিকল্পও**' হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে যদি 'কী কী জিনিস প্রতীক হতে পারে' তা আগে দেখে নিই।

সুবিধার জন্য ৩টি প্রধান শ্রেণিতে আমরা সিম্বলগুলোকে ভাগ করে নেব।[২০]

---

[১৯] ibid, পৃষ্ঠা : ১২৭।

[২০] ibid, পৃষ্ঠা : ১২৯।

কষ্টিপাথর-৩

কাঠগড়া

ডা. শামসুল আরেফীন

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূ চি প ত্র

চ্যালেঞ্জ /১০
কীমাশ্চর্যম / ১৩
ঘটনা কী? / ১৯
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে / ২০
বিপদটা কোথায়? / ২৪
সমস্যা ১: নগদে পল্টি / ২৪

পর্ব ১

ধর্ম ও বিজ্ঞান ২৭

ধর্ম কী? / ২৭
ঈমানের সাথে যুক্তি-অভিজ্ঞতার সম্পর্ক / ২৮
ঈমানের ভিত্তি: রিসালাত ও মু'জিযা / ২৮
গায়েবের বিষয়গুলোতে বিশ্বাস / ৩৪
বিধিবিধানের ওপর বিশ্বাস / ৩৫
বিধানের সাথে পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সম্পর্ক / ৩৭
পার্থক্য / ৩৯

ফলে কী হল? ৪৩

বিজ্ঞানের জন্ম: ইলমুত তাজরিবা / ৪৩
চিকিৎসা বিদ্যায় মুসলিম অবদান / ৪৯
গণিতশাস্ত্রে মুসলিম অবদান / ৫৫

জ্ঞানের হাতবদল ৬০

ইউরোপের অবস্থা / ৬০
হাতবদল / ৬১
ঘটনা প্রবাহ / ৭৬

সমস্যা ২: পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ- পশ্চিমা বিজ্ঞানের রেললাইন / ৮৩
সমস্যা ৩: বিজ্ঞানবাদ / ৮৬
সমস্যা ৪: পুতুলনাচ / ৮৯
বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাহলে কী হবে? / ৯৬

পর্ব ২

গোড়া কেটে আগায় পানি / ১০২
শয়নে-স্বপনে / ১০৪
মধু / ১০৭
কালোজিরা / ১১৭
সুরমা / ১২৬
আর্লি বেড আর্লি রাইজ / ১৩১
রেশমের কাপড় / ১৩৮
খৎনা / ১৪৪
নারীর খৎনা / ১৪৮
হিজামা (cupping) / ১৫১

এখন করণীয় কী? / ১৫৯
বিজ্ঞানী তৈরি করাই কি সমাধান? / ১৬১
রিসার্চ ও আর্টিকেল রেফারেন্স / ১৬৭

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আস-সলাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযাতের তাওফীকে আপনাদের হাতে কষ্টিপাথর সিরিজের ৩য় বই 'কাঠগড়া'। সিরিজে কোনো ধারাবাহিক আলোচনা নেই যে, একের আগে তিন পড়া যাবে না। বা দুই পড়ে নিয়ে তিন পড়তে হবে—এমন না। ১,২,৩ সংখ্যাগুলো এজন্য দেওয়া, যাতে এই পুরো সিরিজটা পড়লে (ধারাবাহিকই হোক কিংবা এলোমেলো) পাঠকের সামনে সামগ্রিক একটা চিত্র ভাসবে। আরেকটা ইচ্ছে আছে, মৃত্যুর পর যেন পাঠকের সুবিধার্থে 'কষ্টিপাথর-সমগ্র' বের করা যায়, এজন্য একই জাতীয় আলোচনাগুলো এভাবে মার্ক দিয়ে রাখা।

গেল বছর 'বিজ্ঞানের দর্শন' (philosophy of science) নিয়ে বিদেশি ইউনিভার্সিটির দুয়েকটা অনলাইন কোর্স করার সুযোগ হলো। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, পুরোটা ছাত্রজীবন ঘাড় গুঁজে বিজ্ঞান পড়েও আমি আসলে জানিই না বিজ্ঞান কী, এর উদ্দেশ্য কী, কীভাবে বিজ্ঞান কাজ করে। এর চেয়ে আফসোসের আর কী হতে পারে যে, এ-প্লাস পাওয়া লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে জানেই না বিজ্ঞান কী, বিজ্ঞান কী বলতে চায়? আমরা জানিই না 'বিজ্ঞানের ইতিহাস'। ফলে বিজ্ঞানপড়ুয়াদের মাঝে বিজ্ঞান নিয়ে একটা ফ্যান্টাসির জন্ম হয়। মজার ব্যাপার হলো, এই ফ্যান্টাসি আরও জোরালো তাদের মাঝে যারা বিজ্ঞানপড়ুয়া নন। যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় সে কথাগুলোই লেখার চেষ্টা করেছি।

আরও দেখলাম, আমাদের দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিজ্ঞানলেখক আর সোশ্যাল মিডিয়ার বিজ্ঞানবাজ গ্রুপগুলো বিজ্ঞানের নামে যা গেলাচ্ছে, তা যতটা না পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞান, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞান-বহির্ভূত দর্শন। এদের বিজ্ঞান বোঝা আর পশ্চিমা একাডেমিক বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের বিজ্ঞান বোঝার মাঝে আসমান-জমিন ফারাক। 'বিজ্ঞান' ইস্যুতে এঁরা চূড়ান্ত অসততার পরিচয় দিয়েছেন।

কিছু জিনিস পীড়া দেয় সব মুসলিমকেই। মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে আমরা ছিলাম। আজ সেই সম্পদ ইউরোপ-আমেরিকার হাতে। যদি ধর্মের সাথে বিজ্ঞান সাংঘর্ষিকই হবে তাহলে ইসলামের শুদ্ধতার যুগেই কেন এলো বিজ্ঞান? আর সে মানিক গেলোই বা কীভাবে পরের হাতে? এই হাতবদলের গল্পটা নিয়ে বেশ কৌতূহল ছিল, আলহামদুলিল্লাহ মিটেছে।

যদি ধর্মে যুক্তি-পর্যবেক্ষণের কোনো স্থান না-ই থাকে, তবে কেন কুরআনে বার বার দেখার

তাগিদ, দিমাগ খাটানোর তাগিদ? তার মানে ইসলাম আর ধর্মের মাঝে কোনো বিরাট পার্থক্য আছে, যা বার বার মিস হয়ে যাচ্ছে। ইসলাম ছিল 'বিজ্ঞানের কারণ'; কীভাবে—সেই আলাপ উঠে এসেছে। মধ্যযুগে মুসলিম সভ্যতায় বিজ্ঞানের লেভেল কেমন ছিল, সেটা আমার মতো করে সাজিয়েছি, যতটুকু আমি বুঝি। এই অবদানগুলোর কথা সব ধরনের পাঠকদের জন্য নানান বইয়ে রয়েছে, যেমন শাইখ মুসা আল হাফিজ সাহেবের 'সহস্রাব্দের ঋণ' বইটির প্রতি আমি ব্যাপকভাবে ঋণী। কিন্তু বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র হিসেবে আমার দরকার ছিল আরেকটু বেশি—আধুনিক বিজ্ঞানের নজরে তাদের অবদানগুলো দেখা। চিকিৎসাবিদ্যা আর গণিত-ই আলোচনায় রেখেছি, কেননা এই দুই ফিল্ডে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান যে কত বড়, তা বুঝেছি। জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন টার্মগুলো বুঝি না বলে আনিনি। তবে মনে রাখার বিষয়, এই-ই সবটুকু নয়, স্রেফ ইসলাম যে জ্ঞানের সূচনা করেছিল, তার লেভেল বোঝানোর জন্য।

সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ডা. রাফান আহমেদের প্রতি। এক, নিজের শত ব্যস্ততার মাঝেও এই বইটি সম্পাদনা করে আমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য। আর দুই, সময়ের দাবি পূরণে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। তাঁর রচিত 'বিশ্বাসের যৌক্তিকতা', 'অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়', 'হোমো স্যাপিয়েন্স: রিটেলিং আওয়ার স্টোরি', 'ইউভাল হারারি: পাঠ ও মূল্যায়ন (পশ্চিমা একাডেমিকদের চোখে)' এবং 'ভাবনার মোহনায়' নিঃসন্দেহে সময়ের দাবি। একটি বিশেষ মহল থেকে বিজ্ঞানের একচেটিয়া ডিলারশীপের দাবির বিপরীতে রাফান আহমেদ বিজ্ঞানের প্রকৃত অনুধাবনের ডাক দিয়ে চলেছেন। আল্লাহ তাঁকে আরও তাওফীক দিন। আমীন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আরমান ফিরমান ভাইয়ের গবেষণামূলক লেখাগুলো থেকেও আমি যারপরনাই উপকৃত হয়েছি। সুখের কথা, অচিরেই ভাইয়ের লেখাগুলো বই আকারে আসছে ইন শা আল্লাহ। বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে ভাইয়ের গভীর পর্যালোচনাগুলো বাংলাভাষীদের সামনে খুলে ধরবে নতুন দিগন্ত। তবে রাফান আহমেদ ও আরমান ভাইয়ের লেখা থেকে যতটুকু গ্রহণ করেছি, তা মূল রেফারেন্সে গিয়ে চেক করে নিয়েছি এবং মূল রেফারেন্সই উল্লেখ করেছি।

বিজ্ঞানের পুরো ইতিহাস ও দর্শন আলোচনা শেষে স্বাভাবিকভাবেই 'এখন করণীয়' নিয়ে কিছু চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। সেগুলো পাঠকের খিদমতে পেশ করেছি নিদারুণ অযোগ্যতায়। হয়তো যোগ্য কেউ কোনোদিন পড়বেন, শুরু হয়ে যাবে কাজ। আবার বিজ্ঞান হবে আমাদের ইন শা আল্লাহ। পথে নামলেই না পথ ফুরোয়, তার আগে পথ চিনতে তো হবে, নাকি?

ডা. শামসুল আরেফীন
১৬ মার্চ, ২০২১ খ্রি:

পর্ব ১

চ্যালেঞ্জ
কীমাশ্চর্যম
ঘটনা কী?
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে
বিপদটা কোথায়?
সমস্যা ১: নগদে পল্টি

ধর্ম ও বিজ্ঞান
ফলে কী হলো? বিজ্ঞানের জন্ম
জ্ঞানের হাতবদল
সমস্যা ২: পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ
সমস্যা ৩: বিজ্ঞানবাদ
সমস্যা ৪: পুতুলনাচ
বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাহলে কী হবে?

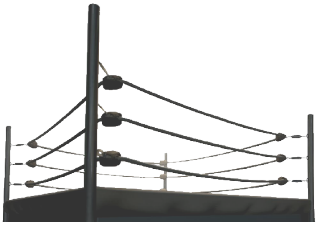

চ্যালেঞ্জ

সব নবিকে নিজের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য 'মু'জিযা' দিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা। কোনো ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হয়, যদি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা সত্যায়িত করে দেন যে, এটা অরিজিনালটারই ফটোকপি, আমি স্বাক্ষরকারী অরিজিনালটা দেখেছি। তেমনি নবিদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য, পাবলিকের সন্দেহ-সংশয় নিরসনের জন্য দেওয়া হতো মু'জিযা, যে ইনিই আল্লাহর সত্যায়িত বার্তাবাহক। সত্যসন্ধানীরা আল্লাহর তাওফীকে চট করে বুঝে যেত, যে ইনিই নবি। যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর আজদাহা সাপটা যখন জাদুকরদের ভাঁওতাবাজিগুলোকে গিলে নিল, জাদুকররা সাথে সাথে বুঝে নিল ঘটনা কী। আর হতভাগারা তা বুঝেও হঠকারিতা করত। মু'জিযা দেখার পরও সেই মু'জিযার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করাতো; নবিকে বলত কবি-জাদুকর-পাগল-জিনে পাওয়া। নবিরা বলতেন, এই দেখো, এই আমার মু'জিযা, এই অলৌকিক ক্ষমতা আমার নিজের না; আমি আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবি। আর মানুষের কথা ছিল, আপনি নবি ছাড়া আর সবকিছু, প্লিজ বইলেন না আপনি নবি। আপনি নবি– কেবল এইটুকু আমরা শুনতে চাই না, জানতেও চাই না। নবি মেনে নিলেই আপনার আল্লাহকে মেনে নিতে হবে, আইন-কানুন মানতে হবে, আপনার বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে হবে[১], জুলুম-অত্যাচারের যে ব্যবস্থাপনা আমরা সাজিয়েছি, সেটা ত্যাগ করে আয়েশ-খ্যাতি-ভোগের জীবন বিসর্জন দিতে হবে। সুতরাং 'আপনি নবি', এইটুকু ছাড়া আর যা বলবেন মেনে নেবো। আর যে মু'জিযা দেখালেন এটার ঐ ব্যাখ্যা আমরা করব না, যা আপনাকে নবি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করে, বরং ঐ ব্যাখ্যাই করব যা আমাদের মগজে ধরে, অভিজ্ঞতায় আসে। একদল মুশরিক হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখেছে নবিজি আঙুল ইশারা করলেন, আর চাঁদ ভেঙে এক খণ্ড এদিকে আরেক খণ্ড ওদিকে সরে যাচ্ছে। তারপরও বলেছে,

---

[১]আবূ জাহ্‌ল নবিজি চলে গেলে মুগীরা ইবনু শু'বা-এর দিকে চেয়ে বলল: 'খোদার কসম আমি জানি, তিনি যা বলছেন তা সত্য কথা। কিন্তু তাঁর কথা আমি এজন্য মানতে পারছি না কারণ তিনি কুসাই গোত্রের। কুসাইরা কাবার মুতাওয়াল্লি হয়েছে, হাজীদের পানি পান করানোর সম্মান পেয়েছে, পরামর্শ মজলিসের ব্যবস্থাপনার গৌরবও তাদের, যুদ্ধে ঝাণ্ডা বহনের ইযযতও তারা নিয়েছে। এখন মেহমানদারিতে আমরা কোনোমতে তাদের সমকক্ষ হয়েছি; আর এদিকে তারা আবার দাবি করছে তাদের ভেতর একজন নবি হয়েছে। খোদার কসম, আমি এটা জীবনেও মানব না।' [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া সূত্রে হায়াতুস সাহাবা, ১/১১১।]

বাহ মুহাম্মাদ বাহ, অস্থির জাদু দেখালে। জাদুতে মোহাচ্ছন্ন করে ভোজবাজি দেখানো যায় আমরা জানি। যেহেতু আপনাকে নবি হিসেবে মেনে নিলে বেশ সমস্যা, অতএব আপনি জাদুকর। আসলে যার হয় না ৯-তে, তার হয় না ৯০-তে।

তো মু'জিযার[২] কথা বলছিলাম। যেমন ধরেন-

- মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মু'জিযা ছিল লাঠিটা ছেড়ে দিলে বিকট অজগর সাপ হতো, আবার ধরে নিলে হয়ে যেত লাঠি। আরেকটা ছিল, বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলে হাত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো, আবার ঢুকিয়ে নিলে নাই হয়ে যেত।
- ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মু'জিযা ছিল হাত বুলিয়ে দিলে অন্ধ-কুষ্ঠ ভালো হয়ে যেত, মাটির পাখি বানিয়ে হাত বুলিয়ে দিলে জীবিত হয়ে উড়ে যেত।
- দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর মু'জিযা ছিল, আমরা যেমন কাদামাটি দিয়ে পাতিল বানাই, উনি লোহা ধরলে ওরকম নরম হয়ে যেত।

আমাদের নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মু'জিযা কী ছিল? আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> "প্রত্যেক নবিকে 'তাঁর যুগের প্রয়োজন মোতাবেক' কিছু মু'জিযা দেওয়া হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁদের প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মু'জিযা দেওয়া হয়েছে তা হলো— আমার ওপর নাযিলকৃত ওহি।"[৩]

কুরআন আমাদের নবির মু'জিযা? কুরআন আবার কেমন মু'জিযা হলো? অন্য মু'জিযাগুলোর সাথে মিলল না তো। আচ্ছা।

মু'জিযা শব্দটি এসেছে আরবি عَجَزَ থেকে। এর অর্থ হলো cripple (পঙ্গু করা); defeat (পরাস্ত করা); disable (অক্ষম করা); frustrate (হতাশ করা); incapacitate (ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া); make it impossible (অসম্ভব করে দেওয়া)। তাহলে মু'জিযা হচ্ছে যা হয়রান করে দেয়, হতভম্ব করে দেয় এতটাই যেন অবশ হয়ে যায় দেহ-মন[৪], বোধবুদ্ধিকে কেড়ে নেয়, চিন্তাকে পঙ্গু করে দেয়, যুক্তিকে পরাস্ত করে দেয়, মানুষ হয়ে যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, কুরআন হতভম্ব করে দেবে সংশয়ীকে বা অবিশ্বাসীকে, যে সত্য খোঁজে এমন কাউকে।

---

[২] মিরাকল/মু'জিযা ontologically possible (অস্তিত্বগতভাবে সম্ভব) এবং epistemically justifiable (জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে যুক্তিগ্রাহ্য)। অনেকে ভাবেন, এটা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। এটা ভুল ধারণা। [সম্পাদক]

[৩] বুখারি, ৪৯৮১।

[৪] https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/عجز/

এখন আসেন, হতবাক মানুষ কখন হয়? বিস্ময়ে। সাধারণ সচরাচর কোনো জিনিস আমাদের বিস্মিত করে না। যা আমি জানি, যা আমি নিজেই পারি, তা আমার কাছে 'এ আর এমন কী'। 'মামুলি কিছু' বিস্ময় জাগায় না। বিস্ময় তখনই আসে যখন কোনোকিছু আমার সাধ্য, আমার অভিজ্ঞতা বা কল্পনার সীমাকে ছাপিয়ে যায়। আমার সামর্থ্যকে যা চ্যালেঞ্জ করে, তার প্রতি আমি বিস্মিত হই- আরিব্বাস রে! কী দারুণ। কুরআনের মুখোমুখি যারা প্রথম হয়েছিল, তারা ছিল জাতিতে আরব। কাব্য ছিল তাদের রক্তে। কাব্য ছিল তাদের বিনোদন, তাদের গণমাধ্যম, তাদের ইতিহাস আর্কাইভ, তাদের মোটিভেশনাল স্পীচ। কাব্যই ছিল তাদের বংশগৌরবের বিষয়- 'অমুক কবি আমাদের বংশের'। যুদ্ধের কবিতা, প্রেমের কবিতা, আটপৌরে জীবনের কবিতা, পূর্বপুরুষের স্তুতিমূলক জাতীয়তাবাদী গোত্রবাদী কবিতা। তাদের উৎকর্ষ, অহমিকা, সাধনা এই কবিতা; যেমন আজকে আমাদের বিজ্ঞান। কুরআন এসেই তাদের উৎকর্ষ যে কবিমানস, সেটা ধরে নাড়া দিল, ছুড়ে দিল চ্যালেঞ্জ-

- ➡ সামর্থ্য থাকে তো নিয়ে এসো এর কাছাকাছি কিছু; একটা কিতাব নিয়ে আসো এমন,[৫]
- ➡ আচ্ছা কমিয়ে দিলাম, ১০টা সূরা বানিয়ে আনো এমন [৬],
- ➡ না পারো তো একটা সূরা-ই নিয়ে এসো এমন,[৭]
- ➡ তাও না পারো এমন একটা আয়াতই বানিয়ে আনো দেখি।[৮]

একটা মাত্র আয়াত?! ৪০ বছর পর্যন্ত যে ইয়াতীম ছেলেটা আমাদের মাঝেই ঘুরে বেড়িয়েছে, আমাদেরই চোখের সামনে। কারও কাছে কবিতা শিখতে দেখলাম না, কখনও কবিতা চর্চা করতে দেখলাম না, শিক্ষাদীক্ষা নেই, লিখতে পড়তেও পারে না। বলা নেই কওয়া নেই, সেই ছেলেটা চ্যালেঞ্জ করছে আমাদের? আমাদের! আমরা খাই কবিতা, ঘুমাই কবিতা, গায়ে দিই কবিতা, মুখ দিয়ে যা-ই বলি তাই হয়ে যায় কবিতা। আমাদের মাঝে আছে বড় বড় সব কবি, যারা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। সেই আমাদেরকেই এই আনপড় ছেলেটা কিনা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে একটা আয়াত বানিয়ে আনার? সে যুগে কাব্যাভিমানী আরব জাতি কুরআনের এই চ্যালেঞ্জকে কীভাবে নিয়েছিল, জানতে মন চাচ্ছে, তাই না? চলুন বেড়িয়ে আসি ১৪০০ বছর আগের মক্কায়।

---

[৫] "বলো, যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।" (সূরা ইসরা, ১৭ : ৮৮।)

[৬] "নাকি তারা বলে, সে এটি রটনা করেছে? বলো, 'তাহলে তোমরা নিদেনপক্ষে দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো (তোমাদের সাহায্যের জন্য) ডেকে নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা হূদ, ১১ : ১৩।)

[৭] "বলো, তবে তোমরা তার মতো একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো (তোমাদের সাহায্যের জন্য) ডাকো, যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্য হয়ে থাকো।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৩৭-৩৮।)

[৮] "তারা কি বলে, সে এটা বানিয়ে বলছে? বরং তারা ঈমান আনে না। অতএব তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ একটি বাণী নিয়ে আসুক।" (সূরা তূর, ৫২ : ৩৩-৩৪।)

কীমাশ্চর্যম!!

২.১ এ কী করলেন শ্রেষ্ঠ কবি

মক্কায় ইসলামের ঘোর শত্রু আবূ জাহ্‌ল যেদিন 'সূরা কাওসার' পয়লা শুনল, নিজেই টাসকি খেয়ে গেল। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল- 'সকল মহিমা প্রভুর জন্য'। কাব্যবোদ্ধা আরবদের নেতা, প্রথম শ্রবণেই বুঝে গেছে 'কাহিনি'। এরপরও কেন সে ইসলাম কবুল করেনি, সেই আলাপটা একটু পড়ে পাড়ছি। এখন যে আলাপটা করছি, সেটা হলো: কা'বার দরজায় টাঙানো ছিল বহুদিন ধরে শ্রেষ্ঠ ৭টি আরবি কবিতা, বলা হতো 'সাবআ মুআল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত সপ্তক'। যখন সূরা কাওসার অবতীর্ণ হয়, তখন এই ৭ জনের কেবল একজন বেঁচে আছে। আবূ জাহ্‌ল তার কাছে নিয়ে গেল 'সূরা কাওসার'। সূরা দেখে কবি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল: 'সকল মহিমা প্রভুর জন্য, এটি মানুষের কথা হতে পারে না'। সে নিজে সেটা হাতে নিয়ে তখন কা'বায় গেল, নিজের কবিতাখানা সেখান থেকে নামিয়ে দিল, সূরা কাওসার লেখা কাগজটা সেখানে টাঙিয়ে দিল, আর নিচে ছন্দ মিলিয়ে আরেকটি লাইন লিখে দিল: 'مَا هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ'- এটা কোনো মানুষের কথা নয়'। [৯]

কাব্যে excellence অর্জনকারী ডাকসাইটে কবি হয়রান হয়ে গেল নিজের সামর্থ্যের অতীত, কল্পনার অতীত ভাষার কারুকাজ দেখে। তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল, যুক্তি লোপ পেল। কুরআন যে মু'জিযা আমাদের নবির। কুরআন কবিতার বই না, তারপরও কাব্যবোদ্ধারা অনুভব করেছে এর মু'জিযা, হয়েছে হয়রান-কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

২.২ ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা

বীর সিপাহসালার খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা। মক্কার অন্যতম ধনী, বার্ষিক আয় ১ কোটি গিনি। কা'বার গিলাফ এক বছর পুরো মক্কা মিলে দেয়, আরেক বছর ওয়ালীদ একা দেয়। বুইঝেন। তার মানে সে মক্কার মুরব্বিদের মধ্যে গণ্যমান্য, তার উপাধি 'রাইহানা কুরাইশ', নিজেকে সে বলত—'ওয়াহীদ ইবনুল ওয়াহীদ', এক পিসের বেটা এক পিস। একবার কুরাইশরা

---

[৯] 160 Miracles and Mysteries of the Quran, ডা. মাজহার কাজী, পৃষ্ঠা ২০১

গেল তার বাসায়:

— আবদু শামস! আবূ তালিবের ভাতিজার জ্বালায় তো পাগল হয়ে গেলাম। সে এগুলা কী পড়ে? এগুলা কি কাব্য, না জাদু, না বাকচাতুর্য? কিছুই তো বুঝতেসিনা।

— আচ্ছা, চলো তো দেখি। আমি নিজে শুনে দেখি।

— চলেন।

কুরাইশ গং এল নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে। ওয়ালীদ বলল:

— মুহাম্মদ! তোমার কিছু কবিতা আমাকে শোনাও তো।

— এগুলো কবিতা নয়। এগুলো আল্লাহর কালাম, যা দ্বারা তিনি ফেরেশতা আর নবিদের সম্মানিত করেছেন।

— শোনাও দেখি আমাকে।

নবিজি তিলওয়াত করলেন সূরা সাজদাহ্-র শুরু থেকে।

"পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে—

১. আলিফ-লাম-মীম

২. এ হলো অবতরণ, এমন কিতাবের যাতে কোনো সন্দেহ নেই; জগৎসমূহের কর্তৃত্বশীল প্রতিপালকের তরফ থেকে।

৩. তারা কি বলে: এটা সে (মুহাম্মাদ) রচনা করেছে?

৪. কক্ষনো না, বরং এটা আপনার রব থেকে আগত সেই পরমসত্য। যাতে আপনি এমন কওমকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা (এর দ্বারা) পাবে সঠিক পথের দিশা।

৫. তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে, ছয় দিনে। এরপর আরশে কর্তৃত্বগ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিবর্তে তোমাদের আর কেউ নেই রক্ষা করার কিংবা সুপারিশ করবার। এরপরও করবে না উপদেশ গ্রহণ?

৬. তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন আসমান থেকে জমিন অব্দি সকল বিষয়। পরিশেষে সবকিছু তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। এমন একটি দিনে, যার সময়কাল তোমাদের হিসেবে হাজার বছরের সমান।

৭. এমনই তিনি। যিনি জানেন সকল গোপন ও প্রকাশ্য। আযীয, রহীম।"

নবিজি থামলেন। কেঁপে উঠল ওয়ালীদ। কুরাইশদের কোনো জবাব না শুনিয়ে হতভম্ব ওয়ালীদ ফিরে গেল নিজের বাসায়। কুরাইশরা বসে থেকে থেকে যখন কোনো খবরই পেল না, সবক'টা গেল আবূ জাহ্লের বাসায়—'ও আবুল হাকাম, আবদু শামস মনে হয় মুহাম্মাদের দ্বীনের দিকে ঝুঁকে গেছে। আর যে এল না কোনো খবর নিয়ে'। আবূ জাহ্লের মাথা নষ্ট, দৌড়ে গেল ওয়ালীদের বাড়িতে—

— চাচা! আপনে তো আমাদের ইজ্জত একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। আমাদের মাথা এক্কেরে হেঁট করে দিলেন। আমাদের দুশমনদের খুশি করে দিলেন মুহাম্মদের দ্বীন গ্রহণ করে। কেমনে করলেন কামডা?

— আমি তার দ্বীন গ্রহণ করিনি। তবে আমি তার মুখ থেকে এমন ওজনদার কথা শুনে এসেছি, যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়।

— এটা কী কোনো ভাষণ-টাষণ?

— না, কোনো ভাষণ ছিল না এটা। ভাষণ তো লাগাতার কথা হয়। কিন্তু এটা এমন গদ্য, যার এক অংশ আরেক অংশের মতো না।

— এটা কী কোনো কবিতা ছিল?

— উহু, কবিতা না। **আমি আরবদের সব ধরনের কবিতা শুনে অভ্যস্ত। এটা কবিতাও না।**

— তাহলে কী এটা?

— আমি একটু ভেবে নিই দাঁড়াও।

পরদিন সকালে—

— ও আবদু শামস, কী খবরটবর। আমাদের প্রশ্নের কী জবাব?

— লোকেদের গিয়ে বলো—এটা জাদু। কেননা এটা হৃদয়কে একদম প্রভাবিত করে ফেলে।

হাজ্জের মৌসুম। কুরাইশদের চোখে ঘুম নেই। সারা আরব থেকে মানুষ আসবে। মুহাম্মাদের এসব অপূর্ব কথাবার্তা শুনলে তো তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। না জানি মুহাম্মাদের দল কত ভারী হয়ে যাবে। প্রধান নেতাদের নিয়ে কুরাইশরা বৈঠক ডাকল। সভায় সিদ্ধান্ত হলো: মক্কায় আগমনের সাথে সাথে হাজীদের কাছে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা শুরু করতে হবে। তাদের মধ্যে প্রবীণতম হলো ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা। সে বলল—

— ভালো কথা। তোমরা যদি মুহাম্মদের ব্যাপারে একেকজন একেক রকম কথা বলো, তাহলে কেউ বিশ্বাস-ই করবে না। তাই যাই বলব, সবাই একই কথা বলব। এবার ঠিক করো তারা জিগ্যেস করলে কী বলবা।

— আমরা বলব, সে একটা গণক।

— তা বলা ঠিক হবে না। আল্লাহর শপথ, সে গণক নয়। আমাদের গণকদের সম্বন্ধে জানা আছে। **গণকরা গুণ গুণ করে যে কথা আওড়ায়, যেসব কথা বানিয়ে বলে সে সবের সাথে কুরআনের সামান্যতম মিল নেই।**

— তাহলে... তাকে পাগল বলা হোক।

— সে তো পাগল নয়। আমরা পাগল লোকদের ব্যাপারে জানি। **পাগলা মাথাখারাপ লোক যে ধরনের আবোল তাবোল কথা বলে, উল্টাপাল্টা আচরণ করে মুহাম্মদের কথা-বার্তায় ও আচরণে তার রেশ মাত্র নেই। মুহাম্মদ যে বাণী পেশ করছে সে কথা শুনে কেউ বিশ্বাস করবে না যে তা পাগলের প্রলাপ বা জিনে ধরা মানুষের উক্তি।**

— তাহলে আমরা তাকে কবি বলি।

— 'সে কবি নয়। **আমরা সব রকমের কবি সম্পর্কে অবহিত। মুহাম্মদের মুখে উচ্চারিত কোনো বাণীর সাথে কবিতার সামান্যতম মিল নেই।**'

— 'তাহলে তাকে জাদুকর বলা হোক।'

— 'সে জাদুকরও নয়। জাদুকরদেরকে আমরা ভালো করে জানি। **জাদু দেখানোর জন্য তারা যেসব কাজ করে থাকে সে ব্যাপারেও তোমরা জানো। মুহাম্মদের ব্যাপারে এসব কথা খাটে না।** তোমরা এতক্ষণ তার ব্যাপারে যেসব বলার প্রস্তাব করেছ লোকেরা তা শুনে বিশ্বাস করবে না বরং অযথা অভিযোগ মনে করবে। আল্লাহর শপথ, তাঁর উচ্চারিত বাণীতে রয়েছে অসম্ভব রকমের মাধুর্য। এসব কালেমার শিকড় মাটির অনেক গভীরে প্রোথিত আর এর শাখা-প্রশাখা খুবই ফলবান।'

— 'যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদ সম্পর্কে কিছু না বলছো, ততক্ষণ পর্যন্ত কওমের লোকেরা তোমার প্রতি খুশি হবে না।'

— তাহলে আমাকে কিছু সময় ভাবতে দাও।

— অতঃপর সে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে বলল,

— 'মুহাম্মদ সম্পর্কে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যে কথাটি বলা যেতে পারে তা হলো, তোমরা আরবের জনগণকে বলবে যে, এ লোকটি জাদুকর। সে এমন কথা বলে যা মানুষকে তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র এবং গোটা পরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়।'

— 'বেশ বেশ, তাই হবে।

তারপর হাজ্জের সময় এলে সবাই মিলে পরিকল্পনা মোতাবেক ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বহিরাগত হাজীদেরকে বলে বেড়াতে লাগল, 'এখানে একজন বড় জাদুকরের আবির্ভাব হয়েছে। তার জাদু পরিবারের মধ্যে বিভেদ পয়দা করে। এ লোকটির ব্যাপারে আপনারা সাবধান থাকবেন।' [১০]

---

[১০] বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ২/১৯৯২০১; আবূ নুআইম, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ১/৩০১-৩০৩; সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৮৮-১৮৯।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা গাফির/মুমিন পাঠ করছিলেন-

> “হা-মীম’। কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি পরাক্রমশালী। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কাছেই সবার প্রত্যাবর্তনস্থল।” (সূরা গাফির, ৪০ : ১-৩।)

শুরুর এই তিনটি আয়াত শুনেই এই ওয়ালীদ বলে উঠল...

> ‘আল্লাহর কসম আমি তার মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না এবং তা কোনো জিনেরও কালাম হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর শব্দ বিন্যাসে রয়েছে এক বিশেষ বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার ঊর্ধ্বে থাকবে এবং এর ওপরে কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা কখনোই মানুষের কালাম নয়।’[১১]

২.৩ নাদর ইবনুল হারিস:

একবার কুরাইশ নেতা নাদর ইবনুল হারিস নিজ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে এক ভাষণ দেন। ভাষণটা একটু দেখি চলেন:

> ‘হে কুরাইশের জনগণ!
>
> আজ তোমরা এমন এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার, যার মুখোমুখি ইতিপূর্বে কখনও হওনি। মুহাম্মাদ ছিল তোমাদেরই বংশের একজন যুবক। তার স্বভাব ও চরিত্রগুণে তোমরা সকলে ছিলে মুগ্ধ। তাকে আপন গোত্রে সর্বাপেক্ষা সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি গণ্য করতে এবং মুখে মুখেও একথা বলতে। আজ যখন তার চুলে বার্ধক্যের আলামত দেখা দিতে শুরু করেছে, আর তিনি এক অসাধারণ কালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছেন তখন তোমরা তাকে জাদুকর বলতে আরম্ভ করেছ।
>
> আল্লাহর কসম! তিনি জাদুকর নন। আমি বহু জাদুকর দেখেছি। তাদের চালচলন, কথাবার্তা, রীতি-রেওয়াজ সবই জেনেছি এবং বুঝেছি। তিনি মোটেই এদের মতো নন।
>
> কখনও তোমরা তাকে গণক বলছো। খোদার কসম! তিনি গণকও নন। আমি অনেক গণক দেখেছি। তাদের কথা শুনেছি। তাঁর কালামের সঙ্গে সেসবের কোনো মিল নেই।
>
> কখনও তাকে তোমরা কবি বলছো। আল্লাহর শপথ! তিনি কবিও নন। আমি নিজে কবিতা ও কাব্যকুশলতার যাবতীয় বিদ্যা অর্জন করেছি। এর নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। খ্যাতনামা কবিদের পদ্যচরণ আমার মুখস্থ। (মুহাম্মাদের বাণী এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত।)
>
> আবার কখনও তোমরা তাকে পাগল বলো। আল্লাহর কসম! তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি। ওদের এলোমেলো আবোল-তাবোল প্রলাপ শুনেছি। (এখানে এসবের কিছুই নেই।)

---

[১১] তাফসীরু কুরতুবি সূত্রে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, সূরা মুদ্দাসসির এর তাফসীর।

হে আমার গোত্রের লোকেরা! তোমরা ব্যাপারটি উদারমনে নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখো। কারণ আল্লাহর কসম, তোমরা এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ।'[১২]

২.৪ উনাইস গিফারি:

সাহাবি আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমার ভাই উনাইস একবার পবিত্র মক্কা নগরীতে যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে আমাকে সে বলে যে, 'মক্কায় একজন লোক আছেন। যিনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার ব্যাপারে সেখানকার অধিবাসীদের মতামত কী?' ভাই বলল, 'কেউ তাকে কবি বলে। কেউ গণক বলে। আর কেউ বলে জাদুকর।'

আমার ভাই উনাইস নিজেই একজন ভালো কবি। (ভাগ্য গণনা ইত্যাদি বিষয়েও তার বেশ জানাশোনা ছিল।) সে আমাকে বলল, 'আমি যতদূর চিন্তা করেছি, লোকজনের সবগুলো মতই অবাস্তব, ত্রুটিপূর্ণ। **তার কথাগুলো না কবিতা, না গণকের ভবিষ্যদ্বাণী, না পাগলের প্রলাপ; বরং আমার দৃষ্টিতে একে সত্যবাণী বলে মনে হয়েছে।'**[১৩]

২.৫ কায়েস ইবনু নুসাইবা

বানূ সুলাইম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি। নাম কায়েস বিনু নুসাইবা। লোকটি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলো। তার পবিত্র জবানে কুরআন তিলাওয়াত শুনল। এরপর রাসূলকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। রাসূল উত্তর প্রদান করলেন। লোকটি তখনই ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে লোকদের বলল, '**আমি রোম-পারস্যের অগণিত সুসাহিত্যিক ও কথা-শিল্পীর বক্তব্য শুনেছি। অসংখ্য ভাগ্যগণকের কথা শোনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। জাদুকরদের কথাবার্তাও প্রায়ই শুনি। কিন্তু মুহাম্মাদের অসাধারণ বাণী আমি আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি।** তোমরা সকলে আমার কথা শোনো, সবাই তার আনুগত্য করে নাও।' এ দাওয়াতে অনুপ্রাণিত হয়ে তার গোষ্ঠীর এক হাজার মানুষ মক্কাবিজয়ের সময় রাসূলের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।[১৪]

---

[১২] বাইহাকি, দালাইল, ২/২০১-২০২; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩২৭-৩২৮; সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৯।

[১৩] মুসলিম, ২৪৭৩-২৪৭৪; সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৯৩।

[১৪] সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৯৩-১৯৪।

ঘটনাগুলো মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহিমাহুল্লাহ) রচিত আল-কুরআন : নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনন্য মু'জিযা ও নুবুওয়াতের প্রমাণ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। মাসিক আল-কাউসার নভেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত। এসকল ঘটনা আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-খাসাইসুল কুবরা' গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

ঘটনা কী?

তাহলে কাহিনি কী আসলে? আরবের জাঁদরেল সব কবি, কাব্যবোদ্ধারা ভিরমি খাচ্ছে কেন? কী এমন আছে কুরআনে।

আরবি সাহিত্য মূলত দুই প্রকার হয়—পদ্য আর গদ্য। পদ্য বা কাব্যের দুটো বৈশিষ্ট্য: ছন্দ (rhyme) আর মাত্রা (metre)। ছন্দ মানে তো বোঝেনই, একই অক্ষর দিয়ে শেষ হওয়া- অন্ত্যমিল। অবশ্য অন্ত্যমিল ছাড়াও ছন্দ হতে পারে। আর মাত্রা হলো, ছন্দ গণনার একক। যেমন: (বাঁশ+বা+গা+নের) এখানে ৪টি মাত্রা। আরবি কবিতায় এই মাত্রাকে বলে 'আল-বিহার' (সমুদ্র)। ছন্দে ছন্দে কাব্যের প্রবাহ বোঝাতে এমন বলা হয়। **আরবি কাব্যে ১৬ রকম বিহার আছে— তাওয়িল, বাসিত, ওয়াফির, কামিল, রাজস, খাফিফ, হাযাজ, মুত্তাকারিব, মুনসারিহ, মুকতাতাব, মাদিদ, মুজতাছ, খাবাব, রামিল, সারিয়া।** [১৫]

আরেক প্রকার আরবি সাহিত্য হলো গদ্য। গদ্য ২ প্রকার—গদ্যকাব্য (সায) আর সিধা গদ্য (মুরসাল)। গদ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো—ইরাকে নিয়োগের পর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের প্রথম ভাষণ, আর প্রাক-ইসলামি যুগে বললে কুস ইবনু সাইদার রচনা। আর সিধা গদ্য মানে নর্মাল বক্তৃতা-টক্তৃতা যেভাবে দেয় আরকি। মজার ব্যাপার হলো, Louis Cheikho কর্তৃক সংকলিত[১৬] ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী সব আরবি কবিতাই এই ১৬ বিহারের কোনো-না-কোনো ফরম্যাটে পড়ে। কিন্তু কুরআন এগুলোর কোনোটাতেই পড়ে না। ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিস্ট Arthur J. Arberry বলছেন: *For the Koran is neither prose nor poetry, but a unique fusion of both.*[১৭] আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কুরাইশ নেতা নাদর ইবনুল হারিসের কথাটুকু: *'আল্লাহর শপথ! তিনি কবিও নন। আমি নিজে কবিতা ও কাব্যকুশলতার যাবতীয় বিদ্যা অর্জন*

---

[১৫] উস্তায আবদুর রহীম গ্রীন-এর আলোচনা থেকে নেওয়া। Joseph Smith –এর সাথে এক বিতর্কে উনি একটি বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছেন। আগ্রহীরা দেখতে পারেন। Lyall's book Translations Of Ancient Arabian Poetry. [C J Lyall, Translations Of Ancient Arabian Poetry, Chiefly Pre-Islamic, Williams & Norgate Ltd., London, 1930]

[১৬] Louis Cheikho, Shu'ara' 'al-Nasraniyah, 1890-1891, Beirut. Vol. 1: Qabla al-Islam and Vol. 2: Ba'da al-Islam

[১৭] A.J. Arberry, The Qur'an interpreted, London 1955, page 29.

করেছি। এর নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। খ্যাতনামা কবিদের পদ্যচরণ আমার মুখস্থ'। এজন্য তারা কুরআনের চ্যালেঞ্জ বুঝেছিল: **কুরআন তাদেরকে বলছে, এমন একটা আয়াত বানাতে যেটা না পদ্য, না গদ্যকাব্য, না ১৬ বিহারে পড়বে, আর না সেটা গণকের স্পীচের মত সরল গদ্য হবে। ফলে আরবের শ্রেষ্ঠ কবি, 'ঝুলন্ত সপ্তক'-এ যার কবিতা টিকেছে, সেও হাল ছেড়ে দিল**—কীভাবে সম্ভব যাবতীয় সব ধরনের বাইরে গিয়ে কিছু বানানো। এটা কোনো মানুষের কম্মো?

এমনকি অমুসলিম আরবি ভাষাবিদ যারা, তারাও বিস্মিত। যদিও ইউরোপীয় প্রকৃতিবাদী দর্শন[১৮] তাদেরকে 'অতিপ্রাকৃত কিছুর অস্তিত্ব' স্বীকার করতে দেয় না, আগেই হিদায়েতের রাস্তা বন্ধ করে, কানে তুলো দিয়ে, চোখে ঠুলি নিয়ে গবেষণায় নামেন তাঁরা। সামনে আমরা দেখব, পশ্চিমা 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' কীভাবে পথ চলে। সবকছুর বস্তুবাদী সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য পশ্চিমা গবেষকরাও কুরআনের ভাষাশৈলীতে মুগ্ধতা আটকে রাখতে পারেনি। প্রকৃতিবাদে 'বদ্ধমনা' বলে হয়তো বিস্ময় প্রকাশ করেননি, কিন্তু তলা দিয়ে মুগ্ধতাটুকু ঠিকই বেরিয়ে গেছে। প্রাচ্যবিদ H A R Gibb বলে ফেলেছেন:

> "'As a literary monument the Koran thus stands by itself, a production unique to the Arabic literature, having neither forerunners nor successors in its own idiom. ... and in forcing the High Arabic idiom into the expression of new ranges of thought the Koran develops a bold and strikingly effective rhetorical prose in which all the resources of syntactical modulation are exploited with great freedom and originality.'[১৯]

> "'সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বললে কুরআনের সমতুল্য কিছু নেই, সে একাই। আরবি সাহিত্যে সে ইউনিক, বাগধারার ব্যবহারে যার আগে-পরে উদাহরণ নেই ... উচ্চমার্গের আরবি বাগধারাকে প্রয়োগ করে কুরআন বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে। আর এর মাধ্যমে সে তৈরি করেছে দৃঢ় এবং আশ্চর্য প্রভাবধারী গদ্যালঙ্কার। যার মাঝে বাক্যগঠনের সকল রসদকে কাজে লাগানো হয়েছে স্বাধীনভাবে এবং মৌলিকত্বের সাথে।'

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে

তাহলে বুঝলাম, সপ্তম শতকে কুরআনকে 'ফেস করা' পয়লা জাতির গর্ব-অহংকার-উৎকর্ষ-সর্বোচ্চ পারদর্শিতা ছিল—কাব্য। বর্তমান যুগে কী বলেন তো? এখন মানবজাতির গর্ব-উৎকর্ষ কী? ভাবা হয় এখন আমাদের সর্বোচ্চ অর্জন হলো—বিজ্ঞান।

---

[১৮] সামনে বিস্তারিত আসছে।

[১৯] H A R Gibb, Arabic Literature - An Introduction, 1963, Oxford at Clarendon Press, p. 36.